গণতন্ত্রই সমাজের কাম্য পরিবেশ

শিবনারায়ণ রায়

প্র ঃ রাজতন্ত্র ও গ্রামীণ নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে দিয়েছে গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র কী-ভাবে সামাজিক গতির মুখ উন্মুখ করল ?

উ ঃ গণতন্ত্রের জ্ঞাতার্থ বা connotation বলতে বোঝায় এমন রাষ্ট্র যেখানে শাসন ব্যবস্থা জনসাধারণের হাতে। অর্থাৎ যেখানে জনসাধারণ সার্বভৌম। এই অর্থে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রই গড়ে ওঠেনি যাকে যথার্থ গণতন্ত্র বলা যায়। আসলে কম বেশি সব দেশেই শাসন ক্ষমতা যাদের হাতে তারা স্পষ্টতই সে সমাজের ঊর্ধবজন— আমলা, পুলিশ, সেনাবাহিনী, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার, আইনসভার সদস্য, রাজনৈতিক দল এবং এদের মধ্যেও তারাই স্পষ্টত উচ্চ সোপানের অধিকারী। সব মিলিয়ে তারা হয়তো সে দেশের নাগরিকদের শতকরা এক শতাংশের বেশী নয়। সমাজতান্ত্রিকরা এদেরই বলেন power elite. যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিকাশের পথে এরাই প্রত্যক্ষ প্রধান অন্তরায়।

তবে এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে গত দু-তিনশ বছরে পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে সাধারণ নাগরিকদের বেশ কিছু ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে এবং ফলে মানব সমাজ গণতন্ত্রের আদর্শের দিকে কিছুটা এগিয়েছে। গণতন্ত্রের ধারণা বেশ প্রাচীন বটে (গ্রীসের দুজন সেরা দার্শনিক প্লেটো, এ্যারিস্টটল গণতন্ত্রের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু ঐ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন নি)। তবে এটিকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা শু হয় আঠারো শতকে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ফরাসী বিপ্লবের ভিতর দিয়ে । গণতান্ত্রিক আদর্শের যেটি মূল দার্শনিক ভিত্তি— অপ্রতিহার্য সর্বজনীন মৌল মানবিক অধিকারাবলীর নৈতিক দর্শন — এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা সেই ভিত্তি স্থাপন করে। যে-রাষ্ট্র এই অধিকারাবলী মান্য করে সেই রাষ্ট্রই শুধু নাগরিক সাধারণের আনুগত্য প্রত্যাশা করতেপারে।

কিন্তু যাকে 'সামাজিক গতি' বা social mobility বলা হয় গণতান্ত্রিক আদর্শের ঘোষণা তার জন্য যথেষ্ট নয়। সামাজিক গতির অর্থ সমাজের নিম্ন স্তর থেকে উপর স্তরে ওঠা সহজতর হওয়া। 'সমান্তরাল গতি' ছড়প্সজনম্ব্রপ্সন্দ্ধপ্ত প্লপ্সন্ত্বপ্তুনদ্ধস্তা অর্থাৎ স্তরের পরিবর্তন না হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া থেকে এটি স্বতন্ত্র। সামাজিক গতিকে সম্ভব করে শিল্প বিপ্লব। এর পলে গ্রামভিত্তিক সভ্যতা থেকে নগর ভিত্তিক সভ্যতার বিবর্তন ঘটে। গ্রামীণ সমাজে প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট । ব্যক্তির জীবন এবং সামাজিক রীতিনীতি ও সম্পর্কাদি পরম্পরার দ্বারা পরিচালিত। শিল্পবিপ্লব গ্রামের মানুষকে শহরে টেনে আনে। পরম্পরা ভেঙ্গে উদ্ভাবনার দিকে উদ্যোগী স্ত্রী-পুষকে আকৃষ্ট করে। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও সম্পর্কাদিতে বিপ্লব ঘটায়। তার ফলে আবার নতুন এক power elite গড়ে ওঠে— কিন্তু পরম্পরা সূত্রে তারা প্রাধিকারী নয়। রাজা এবং অভিজাততন্ত্রকে হারিয়ে প্রধান হয়ে ওঠে অভিজাত শ্রেণী। নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা গণতন্ত্রকে সমর্থন করে। কিন্তু যেহেতু তারা কোন অবস্থাতেই নিজেদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর চায় না, তাই তাদের নিয়ত সচেষ্ট থাকতে হয় যাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক গতি তাদেরই পরিচালনাধীন থাকে। এ যুগে যে সব রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক বলা হয় সেখানে বাইরের কাঠামো বজায় রেখেই কী করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা পুরোপুরি বজায় রাখা যায় সেটাই power elite - দের বিনিদ্র সাধনা।

প্র ঃ গণতন্ত্রে ব্যক্তির উদ্যোগ অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির ভূমিকা গণতন্ত্রের রূপায়ণে কী ভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক রূপলাভ করে ? নিষ্ক্রিয়তা কাটাবার উপায় কী ?

উঃ আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ও ফরাসী বিপ্লবের গণতন্ত্রের আদর্শ ঘোষিত হওয়া সত্বেও এখনও পর্যন্ত যে-কোন দেশেই যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নি; তার একটা কারণ অবশ্যই বুর্জোয়া পাওয়ার এলিটদের উদ্ভব এবং তাদের ক্ষমতার সংরক্ষণ এবং বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিত্য নূতন উদ্ভাবনা। কিন্তু তার অন্য একটা বড় হয়তো বা প্রধান কারণ হল যে জনগণকে সার্বভৌম বলে ঘোষণা করা হল তাদের ভিতরে অধিকাংশের মনে নিজেদের নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ববোধের অনুপস্থিতি। বিবর্তনের পথে অন্য প্রাণীদের মতো মনুষ্য প্রজাতির ভিতর যে প্রায় অফুরন্ত সম্ভাবনা নিহিত অধিকাংশ স্ত্রী-পুষের মধ্যে নানা কারণের সমাবেশে তার বেশীটাই এ তাবৎ বিকশিত হয় নি। যে জিজ্ঞাসা বৃত্তি, বুদ্ধিশীলতা, স্বাধীনতার ক্ষুধা, উদ্ভাবনার তাগিদ, সহযোগের আগ্রহ, সৃজনের প্রেরণা প্রভৃতি সম্ভাবনা নিয়ে প্রত্যেকটি স্ত্রী-পুরুষ জন্মায় সেগুলি শিক্ষা, দাধনা এবং পরিবেশে পুষ্ট হয়ে উঠলে তবেই মানুষ যথার্থ ব্যক্তিতা অর্জন করে। ব্যক্তিতা সম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষ শুধু নিজেকে নয় সমাজকেও বিকশিত করে তোলে। ব্যক্তিতাসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষেরে উদ্যোগ ছাড়া কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব, স্থায়িত্ব এবং বিকাশ সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি যে মানবিক অধিকার ব্যক্তিতাসম্পন্ন মানুষ সে সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন এবং প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। এ-পর্যন্ত গণতন্ত্রের যতটুকু প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার ঘটেছে তার জন্য এদের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিভিন্ন সমাজে মূলত তিন প্রকৃতির মানুষ বিদ্যমান। এক ধরনের মানুষ নিজেরা ভাবে না। স্বাধীন ভাবে বিচার করে বিকল্পের মধ্যে বাছে না, অন্ধের মতো প্রতিষ্ঠিত পরম্পরার অনুসরণ করে জীবন নির্বাহ করেন । এশিয়া এবং আফ্রিকার অধিকাংশ মানুষ এখনও এই অর্থে traditional oriented. দ্বিতীয় প্রকৃতির মানুষরাও নিজেরা ভেবেচিন্তে দায়িত্ব নিয়ে পথ নির্বাচন করে না । তারা বাজ

ারে যখন যা চালু তার অনুসরণ করে । এদের বলা যায় other oriented. এরা বিজ্ঞাপন ও প্রচারের বলি। ইউরো -আমেরিকায় এবং আমাদের এখানে শহুরে মধ্যবিত্তদের অধিকাংশই দ্বিতীয় দলে পড়ে। এই দুই প্রকৃতির স্ত্রী-পুষের উপর নির্ভর করে যথার্থ গণতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে না। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশের জন্য দরকার তৃতীয় প্রকৃতির মানুষ যারা স্বনিয়ন্ত্রিত self-oriented, অনন্যতন্ত্র । তারাই মানবিক অধিকার বিষয়ে সচেতন এবং তার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। যে সমাজে এই প্রকৃতির লোক সংখ্যায় এবং অনুপাতে যত বেশী সেখানেই রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্র ততোটা অগ্রসর। ভোগবৃত্ত স্ত্রী-পুষ গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থার নির্ভরস্থল। নিষ্ক্রিয় মানুষকে গণতন্ত্রের উপযুক্ত নাগরিকে পরিণত করার উপায় নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলা। এর জন্য চাই অধিকার এবং দায়িত্ব বিষয়ে ব্যাপক শিক্ষার আন্দোলন এবং স্বাধীন সংযোগভিত্তিক সারি সারি সংগঠন ।

প্রঃ আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের সমস্যা হিসাবে বড় শক্তির আগ্রাসন ও মাস কালচারের ভূমিকা কী ? এর থেকে অব্যহতির ইঙ্গিত কী দেওয়া সম্ভব ?

উঃ যাকে "মাস কালচার" বলা হয় তা যে গণতন্ত্রের কত বড় শত্রু তা নিয়ে আমি বিস্তারিতভাবে আমার "গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়" প্রবন্ধ গ্রন্থে আলোচনা করেছি। সম্প্রতি এই বইটির তৃতীয় সংস্করণ দেজ-থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক কালে বিভিন্ন প্রভাবশালী প্রচার মাধ্যমের সূত্রে এই "মাসকালচার" বা "গণপিণ্ডের সংস্কৃতি" সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে । নাচ, গান, পোষাক-আসাক থেকে শু করে মানবিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ সবই ক্রমে প্রচার মাধ্যমের দ্বারা নির্দিষ্ট হচ্ছে। এই সব মাধ্যম যে-সব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিরা নিজেদের কুক্ষিগত করেছেন উত্তর-আধুনিক বিচার বুদ্ধি বিমুখ নীতিবোধহীন জীবনযাত্রার তারাই নিয়ামক।

একদিকে "মাসকালচার" যেমন গণতন্ত্রের মানসজমিকে ব্যাধিগ্রস্ত করছে অন্যদিকে জগৎজুড়ে শক্তির কেন্দ্রাভিগ প্রক্রিয়া শুধু গণতন্ত্রের বিকাশকেই ব্যাহত করছে না, মানব প্রজাতির ভবিষ্যৎকেই অনিশ্চিত করে তুলছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুহূর্তে ধবংস করবার যে ভয়াবহ শক্তি গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের হস্তগত হয়েছে, ইতিহাসে তার কোন তুলনা মেলে না। এই আগ্রাসী ধবংস শক্তির বীভৎস রূপ আমরা প্রথম দেখি হিরোসিমা-নাগাসাকিতে। মার্কিন রাষ্ট্র আজ পৃথিবীতে ধবংস শক্তির সব চাইতে আগ্রাসী ধারক বটে, তবে পারমাণবিক আক্রমণে প্রতিবেশী দেশগুলিকে ধবংস করার শক্তি এখন অন্য বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র অর্জন করেছে অথবা অর্জন করার পথে। পরস্পর ধবংস হবার ভয় এ যাবৎ হিরোশিমার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেয় নি। কিন্তু শক্তির কেন্দ্রীকরণ এবং নানা প্রকৃতির আগ্রাসন ক্রমে বেড়েই চলেছে। এই পরিবেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অবশ্যই উজ্জ্বল ঠেকে না।

এই সংকট থেকে উদ্ধারের কোন অবিলম্বে কার্যকরী পন্থা আমার জানা নেই। আমি শুধু বলতে পারি কেন্দ্রায়ন এবং আগ্রাসনকে অপ্রতিরোধ্য বলে না মেনে নিয়ে আমরা যারা গণতন্ত্রের আদর্শে আস্থাশীল তাদের কর্তব্য দেশে দেশে শক্তির কেন্দ্রায়ন এবং আগ্রাসী নীতির বিদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। এ জন্য দরকার মানবিক অধিকার এবং দায়িত্ব বিষয়ে ব্যাপক শিক্ষার উদ্যোগ এবং সে জন্য সক্রিয় নীতিনিষ্ঠ সহযোগভিত্তিক সংগঠন। সাফল্যের কোন প্রত্যাভূতি বা নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন পথ দেখতে পাই না। আইনস্টাইন যখন কী ভাবে যুদ্ধ যথার্থই নিষিদ্ধ করা যায় জানতে চেয়ে ফ্রয়েডকে পত্র লিখেছিলেন তখন ফ্রয়েড কোন কার্যকরী পথ বাতলাতে পারেননি। (Freud-Civilisation and its Discontent, 1930, Einstein & Freud - Why War 1932)

প্রঃ বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রের রূপায়নে রাষ্ট্রসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের ভূমিকা অবশ্যই গুত্বপূর্ণ। এবিষয়ে যদি কিছু আলোকপাত করেন।

উঃ রাষ্ট্রসংঘ প্রথম থেকেই দুই ধরনের অসাম্যের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল। মহাযুদ্ধের শেষে এক দল ছিল বিজয়ী, এক দল বিজিত। রাষ্ট্রসংঘ গঠনে যারা বিজিত তাদের কোন হাত ছিল না। সমস্ত কর্তৃত্বই ছিল বিজয়ীদের হাতের মুঠোয়। দ্বিতীয়ত, বিজয়ীদের মধ্যে যারা প্রধান তারাই শুধু নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হবার ফলে সিদ্ধান্ত নেবার আসল ক্ষমতা রয়ে গেল তাদের দখলে। আপাত দৃষ্টিতে জেনারেল এ্যাসেমব্লির মাধ্যমে গণতন্ত্রের একটা কাঠামো গড়া হল বটে তবে কার্যকরী সামর্থ্য রয়ে গেল নিতান্ত সীমাবদ্ধ ।

রাষ্ট্রসংঘ হবার পর বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বিজয়ীদের মধ্যে দুই বড় সাম্রাজ্যব্যবস্থা — ব্রিটিশ ও ফরাসী — কিছু কালের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়। শ সাম্রাজ্য এখন বিলুপ্ত। ফলে রাষ্ট্রসংঘে এবং বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন রাষ্ট্রের এখন প্রায় একচেটিয়া প্রাধান্য। তবে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি অনেকটা সম্মিলিত হবার ফলে মার্কিন প্রাধান্যের বিস্তারে তারা কিছুটা বাধা দিতে পারছে । তা ছাড়া আর্থিক দিক থেকে জাপান এবং রাজনৈতিক দিক থেকে কম্যুনিষ্ট চীনও শক্তি হিসাবে আজ মোটেই নগণ্য নয়। এ সবসত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে কী মাস কালচার কী আর্থিক - রাষ্ট্রিক -সামরিক আগ্রাসন সব দিক দিয়েই বর্তমান পৃথিবীতে মার্কিন রাষ্ট্র প্রধান। এবং সে রাষ্ট্রের বর্তমানে যিনি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট তিনি এমনি নির্বোধ এবং ক্ষমতামত্ত যে তার পক্ষে একুশ শতকের গোড়াতেই আর একটা মহাযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। ইরাক আগ্রাসনের ফলে যে নতুন ক্রুসেড সূচিত হবে তার ভয়াবহতা অকল্পনীয়।

গণতন্ত্রের দিক থেকে রাষ্ট্রসংঘের সব চাইতে স্থায়ী এবং প্রধান অবদান হল Declaration of Universal Human Rights. যে ভিত্তির উপরে যথার্থ গণতন্ত্র দাঁড়াবার কথা এই ঘোষণাপত্র তার মহৎ নির্দেশিকা। কিন্তু বহু সদস্য রাষ্ট্র এই ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করে নি। ফলত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং প্রবর্ধনে রাষ্ট্রসংঘের খুব যে একটা ভূমিকা আছে এখন মনে হয় না।

অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দেশে দেশে ব্যক্তিগত বা সংগঠিত ভাবে কেন্দ্রায়ন এবং আগ্রাসনের বিদ্ধে এবং গণতন্ত্রের সপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলাই আসল কাজ। রাষ্ট্রসংঘকে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসাবে উপযোগী হতে হলে তার সংবিধানে ও কর্মপন্থায় ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। তা নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার মূল্য আছে। কিন্তু যে আন্দোলনের উল্লেখ করেছি তা বলশালী না - হওয়া পর্যন্ত সংবিধানের কোন কার্যকরী রূপান্তর সম্ভব নয়।

প্রঃ গণতান্ত্রিক কার্যকলাপে দলীয় শৃঙ্খল এক সমস্যা। এর সমাধানে মানবেন্দ্র রায়ের ভাবনার কিছু পরিচয় যদি তুলে ধরেন।

উঃ পশ্চিমে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে। এর কারণ প্রথমত, সব সমাজেই বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা আছে। দ্বিতীয়ত, কোন একটি মাত্র পথেই কোন সমাজের সব সমস্যার সমাধান মিলবে এ দাবী অবাস্তব এবং অসংগত। ফলে বিভিন্ন সম্ভাব্য পথের অনুসারকেদের পক্ষে বিভিন্ন দল গড়া স্বাভাবিক। তৃতীয়ত, কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠী নির্বাচনের ফলে ক্ষমতায় এলে তাদের সংযত রাখবার জন্য প্রতিপক্ষ দল দরকার। পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল হেরে গেলে শাসনের দায়িত্ব ভার নেবার জন্যও এই প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব জরুরি। এই সব কারণে প্রথমে পশ্চিমে এবং পরে পশ্চিমের অনুকরণে অন্য দেশেও দলব্যবস্থা (party system) গড়ে ওঠে।

কিন্তু দলতন্ত্র অবশ্যই গণতন্ত্র নয়। প্রথমত দল মাত্রই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের চাইতে দলের আংশিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাকে দলীয় নির্দেশের অধীন করে দলব্যবস্থা গণতন্ত্রের মূল নীতিকেই বরবাদ করে। তৃতীয়ত, দলে মুখ্য এবং প্রায় একমাত্র উদ্দেশ্য হল ক্ষমতায় আসীন হওয়া এবং ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত না হওয়া। এ জন্য এমন কোন দুর্নীতি নেই প্রয়োজন হলে দলীয় নেতৃত্ব যার

আশ্রয় নিতে সঙ্কোচ বোধ করে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিলেতে, ফ্রান্সে, আমেরিকাতে, জাপানে সর্বত্র তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশেই দেখতে পাই ক্ষমতার লোভে রাজনৈতিক দলগুলোতে অনাচারের প্রায় সর্বব্যাপিতা।

মানবেন্দ্রনাথ জীবনের একটা বড় অংশ দলীয় রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, প্রথমে স্বদেশী গুপ্ত রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে, পরে কমিন্টার্নের নেতা হিসাবে। আরো পরে কংগ্রেসের অন্যতম বামপন্থী নেতা হিসাবে। দীর্ঘদিনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি শেষ জীবনে সিদ্ধান্তে আসেন যে সুস্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে দলতন্ত্র একটা প্রধান বাধা। তাঁর শেষ পর্যায়ের লেখালেখিতে তিনি দলহীন রাজনীতির তত্ত্বপ্রচার করেন । সংক্ষেপে বলতে গেলে মানবেন্দ্র পরিকল্পনা করেছিলেন এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান অংশ একেবারে নীচের তলায় স্থানীয় সংগঠিত সমাজের হাতেই থাকবে। স্থানীয় প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী-পুষেরা নির্বাচন করবে স্থানীয় গণসমিতি বা people's committee. তাদের হাতেই স্থানীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পথঘাট, শান্তিরক্ষা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি মূল বিষয়গুলি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব থাকবে। অনেকগুলি গ্রামের স্থানীয় গণসমিতি নির্বাচন করবে জেলার গণসমিতি, জেলার গণসমিতিগুলি মিলে নির্বাচন করবে প্রাদেশিক গণসমিতি। এইভাবে পিরামিডের আকারে একটি কাঠামো গড়ে উঠবে যেখানে সর্বোচ্চস্তরে জাতীয় সমিতি বা আইন সভার হাতে নির্দিষ্ট অল্প কয়েকটি ব্যাপারে দায়িত্ব থাকবে। যে প্রক্রিয়াটির উপরে মানবেন্দ্র জোর দিয়েছিলেন তা হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রতিটি সামূহিক সিদ্ধান্তে সংগঠিত জনগণের কার্যকরী ভূমিকা। কিন্তু এই বিকেন্দ্রন এবং সংগঠিত জনগণের কার্যকরী ভূমিকা সম্ভব করতে হলে প্রথমেই চাই জনগণের মানস উজ্জীবন। মানবেন্দ্র একেই বলতেন প্রকৃত রেনেসাঁস। এটি বিহনে যথার্থ গণতন্ত্র যার তিনি নাম দিয়েছিলেন Radical Democracy তার উদ্ভব অসম্ভব ।

প্রঃ গণতন্ত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। এই বিকেন্দ্রীকরণের উপকার ও অপকার সম্পর্কে যদি কিছু বলেন ।

গণতন্ত্রে বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে দেশে বিদেশে অনেক মনীশী লিখেছেন। এই মতবাদের সব চাইতে চরমপন্থী প্রবক্তারা এ্যানার্কিস্ট বা নৈরাজ্যবাদী। কিন্তু যারা নৈরাজ্যবাদী নয় এমন অনেক ভাবুকও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছেন এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে খর্ব করে সেই ক্ষমতাকে ছোট ছোট বহু সংগঠনে ছড়িয়ে দেবার সপক্ষে লিখেছেন। প্রুঁধো, ক্রপট্‌কিন, এলিজে, রেক্লু, এরিকো মালেতেস্তা, ড লফ রকার এদের কথা বাদ দিলেও বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে নানা দিক থেকে যুক্তি দিয়েছে শুমেকার, লেভি স্ট্রাউস,হেজেল হেন্ডারসন এবং আরো অনেকে । জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে নানা বিভিন্নতা সত্ত্বেও এদেশের অন্তত তিন জন প্রধান ভাবুক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে চেষ্টিত হয়েছিলেন — রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও মানবেন্দ্র রায় ।

বিকেন্দ্রীকরণের একটা দিকের কথা মানবেন্দ্র প্রসঙ্গে আগেই বলেছি। বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান ও প্রত্যক্ষ সুবিধা হল তার ফলে সাধারণ স্ত্রী-পুষ সব ব্যাপারে সরকারের উপর নির্ভর করে নাবালক হয়ে বসে থাকে না। পরস্পরের সহযোগে নাগরিক জীবনের সাধারণ যে সব প্রয়োজন যেমন শিক্ষা , স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি তার দায়িত্ব তাদের নিতে হয়। গ্রামের র্বাচিত প্রতিনিধিরাই যদি ন্যায় বিচারের দায়িত্ব নেয় তা হলে কে যাবে সময় ও অর্থ ব্যয় করে জেলা বা রাজধানীর আদালতে। বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় স্থানীয় স্ত্রী-পুরুষ যখন স্থানীয় প্রয়োজন এবং সমস্যা মেটানোর ভার নেয় তাদেরও ব্যক্তি হিসাবে বিকাশ ঘটে। পিরামিডের ধাপে ধাপে সংগঠন যতো ওপরে ওঠে ততো তার দায়িত্বের ভৌগোলিক সীমা বাড়ে তার শক্তির সীমা ততো কমে আসে। বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম ধাপ ফেডারেশন পরের ধাপ কনফেডারেশন। পরিণত ধাপ গণসমিতি ভিত্তিক র‍্যাডিকাল ডেমক্রাসী ।

বিকেন্দ্রীকরণের ফলে শুধু ব্যক্তির বিকাশের পথ সুগম হয় না, একটি দেশের মধ্যে বিচিত্র যেসব ভাষা, লোকসংস্কৃতি, ধ্যানধারণা বর্তমান তারাও বিকাশের সুযোগ পায় । স্থানীয় সমাজের যে মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সমসযা বর্তমান স্থানীয় মানুষ তা যেমন জানে, দূরবর্তী রাজধানীর কর্তাদের তেমন ভাবে জানবার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। কেন্দ্রাভীমুখি রাষ্ট্র চায় সব কিছুকে পিন্ডিভূত করে তাকে এক ছাঁচে ফেলে শাসনকার্য সহজতর করতে। ব্যক্তির বিকাশে বা বৈচিত্র্যের পরিস্ফুটনে কেন্দ্রীয় শক্তির কোন আগ্রহ তো নেইই বরং প্রবল বিরোধিতা আছে। শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের আর একটা সুফল হল যে তার ফলে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের যুদ্ধ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে । কারণ এই প্রক্রিয়ার ফলে রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা অনেকটাই হ্রাস পায়। এবং নিচের তলা থেকে সমর্থন না পেলে যুদ্ধ যদি বা ঘোষণা করা হয় চালানো যায় না ।

তবে বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যা কম নয় । প্রথমত, সাধারণ স্ত্রী-পুষ তাদের নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন ও সক্রিয় না হলে বিকেন্দ্রীকরণ আদৌ কার্যকরী হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র গোষ্ঠিতে পর্যবসিত হওয়া নয়। যখন অনেক স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠি একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন স্বভাবতই কিছু কিছু দায়িত্বভার কেন্দ্রের হাতে রাখতেই হয় যেমন বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা, পররাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, সারাদেশে একটি সাধারণ মুদ্রা ব্যবস্থা। কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি নিলে কেন্দ্রের এই ক্ষমতার অপব্যবহার অসাধ্য করা যায় তা নিয়ে আরো অনেক বিচার বিশ্লেষণ দরকার।

(প্রশ্নোত্তর আকারে লেখাটি রচনার জন্য সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সমীর রায় —স)

গণতন্ত্রই ব্যক্তির বিকাশের পরিবেশ

ব্যক্তির বিকাশেই গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com